বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ

ইউনিট ১০

বাংলার কৃষকের জীবনে প্রাচুর্য ছিল না কখনও। জীবন ধারণ করতে পারত কোনভাবে। কিন্তু সে অবস্থারও ব্যাপক পরিবর্তন হতে থাকে সতের শতক থেকে। সতের ও আঠারো শতকে ইংরেজ বণিক শ্রেণির আগ্রাসন কেড়ে নিতে থাকে বাংলার কৃষকের মুখের হাসি, তাদের আনন্দ উৎসব। প্রথমে তারা ধ্বংস করেছিল গ্রাম বাংলার কুটির শিল্প, তারপর তাদের নজর পড়ে এদেশের উর্বর জমির উপর। অতিরিক্ত অর্থের লোভে ভূমি রাজস্ব আদায়ে একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। যে পরীক্ষার নিষ্ঠুর বলি হয় বাংলার কৃষক, সাধারণ মানুষ। ফলে তীব্র শোষণে অসহায় কৃষক সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এ বিদ্রোহ ক্রমাগত চলতে থাকে আঠারো শতকের শেষাবধি থেকে উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত। এর সঙ্গে সঙ্গে সূত্রপাত ঘটে বাংলার মুসলমান সমাজে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের। যা পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১০.১ ঃ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ
পাঠ-১০.২ ঃ তিতুমীরের সংগ্রাম
পাঠ-১০.৩ ঃ নীল বিদ্রোহ
পাঠ-১০.৪ ঃ ফরায়েজি আন্দোলন

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

পাঠ-১০.১ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ফকির সন্ন্যাসীদের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- তিতুমীরের নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী বলতে পারবেন;
- নীল চাষীদের উপর চরম নির্যাতনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফরায়েজি মতবাদ হাজী শরিয়ত উল্লাহর সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ভিক্ষাবৃত্তি মুষ্টি-সংগ্রহ, তীর্থস্থান, মজনুশাহ, ভবানীপাঠক, গেরিলা পদ্ধতি, লেফটেন্যান্ট ব্রেনান

ভূমিকা

ফকির-সন্ন্যাসীরা ছিল বাংলার অধিবাসী। এরা ছিল হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক একটি দল। এরা সাধনায় সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে সারা বছর দেশের একস্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াতো। ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে উভয় গোষ্ঠি পরিচিত ছিল। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিদ্রোহী হতে এবং অস্ত্র ধারণ করতে হয়। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ চলতে থাকে।

ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের কারণ

বাংলার ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ। আঠারো শতকের শেষার্ধে এই বিদ্রোহের শুরু। এর আগে নবাব মীর কাশিম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীদের সাহায্য চান। এই ডাকে সাড়া দিয়ে ফকির-সন্ন্যাসীরা নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাশিম পালিয়ে গেলেও ফকির-সন্ন্যাসীরা তাদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।

নবাবকে সাহায্য করার কারণে ইংরেজরা তাদের গতিবিধির প্রতি কড়া নজর রাখতে থাকে। বাংলার ফকির-সন্ন্যাসীরা তাদের রীতি অনুযায়ী ভিক্ষাবৃত্তি বা মুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। ধর্মীয় উৎসব, তীর্থস্থান দর্শন উপলক্ষে সারা বছর তারা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াত। তাদের সাথে নিরাপত্তার জন্য নানা ধরনের হালকা অস্ত্র থাকত। বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল স্বাধীন এবং মুক্ত। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাদের অবাধ চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করতে থাকে।

মজনু শাহের বিদ্রোহ

সন্ন্যাসীদের নেতা ভবানী পাঠক

তীর্থস্থান দর্শনের উপর করারোপ করে, ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণা করে। তাছাড়া তাদেরকে ডাকাত-দস্যু বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে ফকির সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। বিদ্রোহী ফকির দলের নেতার নাম ছিল মজনু শাহ। আর সন্ন্যাসীদের নেতার নাম ছিল ভবানী পাঠক। তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি কুঠি, জমিদারদের কাছারি ও নায়েব-গোমস্তার বাড়ি।

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে মজনু শাহ সারা উত্তর বাংলায় ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা শুরু করেন। ১৭৭৭ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। তবে এ আন্দোলনের তীব্রতা ছিল উত্তর বঙ্গে। এই সব অঞ্চলে ইংরেজদের সঙ্গে বিদ্রোহী ফকির-সন্ন্যাসীদের বহু সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। এ সব সংঘর্ষে বিদ্রোহীরা অনেক ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে এবং কোম্পানির বহু কুঠি লুঠ করে।

ফকির মজনু শাহর যুদ্ধ কৌশল ছিল গেরিলা পদ্ধতি, অর্থাৎ অতর্কিতে আক্রমণ করে নিরাপদে সরে যাওয়া। ইংরেজদের পক্ষে তাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা কখনই সম্ভব হয়নি। তিনি ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যবরণ করলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুসা শাহ, সোবানশাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, মাদার বক্স প্রমুখ ফকির। এই নেতারা কয়েক বছর ইংরেজ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। অপরদিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ভবানী-পাঠক ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণে দুই সহকারীসহ নিহত হন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন তিনি। ফলে তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

ব্যর্থতার কারণ

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ফকির সন্ন্যাসীদের ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও দৃঢ় নেতৃত্বের অভাব। তাছাড়া মজনু শাহর মৃত্যুর পরে ফকিরদের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল ক্রমশ আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়। ফকির-সন্ন্যাসীরা কোনো এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিল না। ফলে বিদ্রোহীরা স্থানীয়দের সহযোগিতা সহানুভূতি পেতে ব্যর্থ হয়। অস্ত্র, রণকৌশল সবদিক দিয়ে তারা ইংরেজ সৈন্যদের সমকক্ষ ছিল না। ফলে ফকির সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের উন্নত, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, রণকৌশল, সামরিক প্রযুক্তি এবং বিশাল সেনাবাহিনীর কাছে প্রাণপণ লড়াই করেও হেরে যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

ফকির সন্ন্যাসীদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম ছিল তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বনের উপর কোম্পানি হস্তক্ষেপের কারণে তারা তাদের সনাতন অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। এ অবস্থায় নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই তারা ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। এই সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও, বিদেশী ইংরেজ শাসকদের নির্যাতনমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বাংলার সাধারণ নিঃস্ব মানুষের পক্ষ থেকে এটাই ছিল প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ফকির সন্যাসী বিদ্রোহ কতদিন ব্যাপি চলেছিল? (সময়কাল অনযায়ী)

ক) ১৭৬০ থেকে ১৭৭১ খ) ১৭৬০ থেকে ১৮০০

গ) ১৭৭৭ থেকে ১৮০০ ঘ) ১৭৮৭ থেকে ১৮০০ খ্রি:

২। ফকিরদের বিদ্রোহী দলের নেতা কে ছিলেন–

ক) বলাকি শাহ খ) চেরাগ আলী শাহ

গ) মজনুশাহ ঘ) মাদার বকস

৩। ফকির সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়- কারণ ইংরেজরা–

i) তাদেরকে ডাকাত বা দস্যু বলে চিহ্নিত করছিল

ii) তাদের তীর্থস্থান দর্শনে কর আরোপ করেছিল

iii) তাদের চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করতো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.২ তিতুমীরের সংগ্রাম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আন্দোলনের একটি বর্ণনা দিতে পারবেন;
- এ আন্দোলনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	তাহরিক-ই-মুহম্মদিয়া, ওয়াহাবি, মীর নিসার আলী, গোলাম মাসুম, বাঁশের কেল্লা, লাঠিয়াল বাহিনী, মেজর স্কট,

ভূমিকা

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় প্রায় একই সময়ে দুটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের শুরু হয়। পূর্ব বাংলার আন্দোলনটি ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত। আর পশ্চিম বাংলার আন্দোলনের নাম ওয়াহাবি বা 'তারিক-ই-মুহম্মদীয়া'। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তিতুমীর। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে এ আন্দোলন শুরু এবং শেষ হয় ১৮৩১ ক্রিস্টাব্দে তিতুমীরের শাহাদাৎ বরণের মধ্য দিয়ে।

তিতুমীরের সংগ্রাম

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর ভারত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যখন ওয়াহাবি আন্দোলনের (তাহরিক-ই-মুহম্মদীয়া) জোয়ার চলছে, তখন পশ্চিম বঙ্গের বারাসাত অঞ্চলে তিতুমীরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজের ধর্মীয়, সামাজিক কুসংস্কার দূর করে মুসলিম সম্প্রদায়কে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের সঠিক পথ নির্দেশ করাই এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। বাংলার ওয়াহাবিরাও তিতুমীরের নেতৃত্বে একই উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়েছিল। তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত 'তাহরিক-ই-মুহম্মদীয়া' আন্দোলন বা ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ শহীদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। তিতুমীর হজকরার জন্য মক্কা শরিফ যান এবং

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর

১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। দেশের ফিরে তিনি ধর্মীয় সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে বহু মুসলমান, বিশেষ করে চব্বিশ পরগনা এবং নদীয়া জেলার বহু কৃষক, তাঁতী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। ফলে জমিদাররা মুসলমান প্রজাদের উপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং তাদের প্রতি নানা নির্যাতনমূলক আচরণ শুরু করে। তিতুমীর এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে সুবিচার চেয়ে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত তিনি ও তাঁর অনুসারীরা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমীর তাঁর প্রধান ঘাটি স্থাপন করেন। নির্মাণ করেন ইতিহাস খ্যাত তাঁর বাঁশের কেল্লা। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন সুদক্ষ শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী। ইংরেজ জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমীরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে কৃষকদের সংঘবদ্ধতা এবং তিতুমীরের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে উঠে শাসক-শোষক, জমিদার শ্রেণি।

ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ

জমিদারদের প্ররোচনায় ইংরেজ সরকার তিতুমীর এবং তার অনুসারীদের দমনের জন্য বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজেন্ডারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠায়। কিন্তু তারা তিতুমীরের বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৫ জন ইংরেজ সৈন্য নিহত ও বহু আহত হয়। কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পাঠানো ইংরেজ বাহিনীও তিতুমীরের বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন বড় লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীরের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার এক বিশাল সুশিক্ষিত সেনা বাহিনী প্রেরণ করে। মেজর স্কটের নেতৃত্বে এই বাহিনী তিতুমীরের নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে। ইংরেজদের কামান বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে পরাজিত হয় তিতুমীরের বাহিনী। তিনি যুদ্ধে নিহত হন। গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা উড়ে যায়। এ ভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলনের। এই যুদ্ধে তিতুমীরের ৫০ জন অনুসারী নিহত হন। গোলাম

মাসুমসহ ২৫০ জনকে বন্দি করা হয়। পরে এক প্রহসনমূলক বিচারে গোলাম মাসুমকে ফাঁসি এবং অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

তিতুমীর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজদের গোলাবারুদ, নীলকর, জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী প্রতিরোধের মুখে তাঁর বাঁশের কেল্লা ছিল দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক। যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে সাহস যুগিয়েছে। প্রেরণা যুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	তিতুমীরের বিরুদ্ধে সশস্ত্রযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারি ব্যক্তিদের নাম লিখুন। নারিকেলবাড়িয়ার যুদ্ধে তিতুমীরের পক্ষের কতজন শহীদ, কতজন বন্দি এবং কয়জনের ফাঁসি হয় তার তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

তিতুমীরের পরিচালিত তাহরিক-ই-মুহাম্মদীয়া বা ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার। পরবর্তিতে এটি একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। যা শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। ইংরেজ সরকার, জমিদার নীলকরদের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের মুখে তিতুমীর ও তার বাহিনী পরাজিত হয়। এ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও পরবর্তিকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে এই সংগ্রাম প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় গুরুত্ব এটাই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। তিতুমীর পরিচালিত আন্দোলনের নাম কী?
ক) তাহরিক-ই-মুহাম্মদিয়া খ) ফরায়েজি গ) খিলাফত ঘ) ওয়াহাবি

২। তিতুমিরের দুর্গ কিসের তৈরি ছিল? (অনুধানব)
ক) ইটের খ) মাটির গ) বাঁশের ঘ) টিনের

৩। বাংলার ওয়াহাবি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল (অনুধাবন)?
i) তিতুমীরের নেতৃত্বে ii) হাজী শরিয়তউল্লাহর নেতৃত্বে iii) মজনু শাহের নেতৃত্বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। তিতুমীরের প্রকৃত/আসল নাম কী? (জ্ঞান)
ক) আমির আলী খ) মীর নিসার আলী গ) মাওলানা মোহাম্মদ আলী ঘ) মাওলানা শওকত আলী

সৃজনশীল প্রশ্ন

মুক্তিযোদ্ধা মাখন কুদ্দুস ২০১৬ সালে রক্ত ঝড়া মার্চের এক শিক্ষার্থী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন মুক্তিযোদ্ধারা কঠিন আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করেছে। তারা ইতিহাসের একজন বীর যোদ্ধার আত্মত্যাগ থেকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা লাভ করেছে সেই যোদ্ধা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন নিজস্ব চিন্তায় তৈরি কেল্লা তৈরি করে। আর বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বাঙালি শহীদ হিসেবে আজও অমর হয়ে আছেন।

ক. কোন গ্রামে তিতুমীর তাঁর প্রধান ঘাটি স্থাপন করেন?

খ. তিতুমীর পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকে পাঠ্য বইয়ের কোন যোদ্ধার কথা স্মরণ করা হয়েছে? ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে তার সবচাইতে বিখ্যাত দিকটি তুলে ধরুন।

ঘ. সকল স্বাধীনতা সংগ্রামে তার আত্মত্যাগ হবে অনুপ্রেরণার উৎস- আপনি কী একমত? যুক্তি দিন।

পাঠ-১০.৩ নীল বিদ্রোহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- নীল চাষের নামে কৃষকদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- নীল চাষের কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	খাদ্য ফসল, বাণিজ্য ফসল, নীল চাষি, নীলকর, দাদন, 'অনারারি', নীল কমিশন, 'ইন্ডিগো কন্ট্রাক্টস অ্যাক্ট'

ভূমিকা

ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে। উপমহাদেশের শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে তারা এদেশের শাসক হয়ে উঠে। তবে সব সময় তাদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি ছিল সজাগ। এই সজাগ ব্যবসায়ী বুদ্ধির কারণেই বাংলার উর্বর ফসলের ক্ষেতে তাদের দৃষ্টি পড়ে। তারা এই উর্বর ক্ষেত গুলোতে খাদ্য ফসলের (খাবার ফসল) পরিবর্তে বাণিজ্য ফসল (বাণিজ্যের জন্য যে ফসল) উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠে। নীল ছিল তাদের সেই বাণিজ্য ফসল।

নীল চাষের কারণ

আঠারো শতকে নীল ব্যবসা ছিল খুবই লাভজনক। বস্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড় রং করার জন্য ব্রিটেনে নীলের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। তাছাড়া আমেরিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কারণে ইংরেজ বণিকদের সেখানে নীল চাষ করা সম্ভব ছিল না। ফলে তাদের বিকল্প ব্যবস্থার চিন্তা করতে হয়। বাংলায় নীল চাষ ছিল সেই বিকল্প চিন্তার ফসল। যে কারণে বাংলা হয়ে উঠে নীল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় ইংরেজ আমলে নীল চাষ শুরু হয়।

কৃষক নীল চাষে বাধ্য হয়

বাংলার কৃষকদের উপর ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে তাদের নীল চাষে বাধ্য করা। নীল চাষের জন্য নীলকররা কৃষকদের সর্বোৎকৃষ্ট জমি বেছে নিতো। কৃষকদের নীলচাষের জন্য অগ্রীম অর্থ গ্রহণে (দাদন) বাধ্য করা হতো। আর একবার এই দাদন গ্রহণ করলে সুদ-আসলে যতই কৃষকরা ঋণ পরিশোধ করুক না কেন, বংশ পরম্পরায় কোনো দিনই ঋণ শোধ হতো না। নীল চাষে কৃষকরা রাজি না হলে তাদের উপর চরম অত্যাচার চালানো হতো। বাংলাদেশে নীলের ব্যবসা ছিল একচেটিয়া ইংরেজ বণিকদের। ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, যশোর, রাজশাহী, নদিয়া, মুর্শিদাবাদে ব্যাপক নীল চাষ হতো।

জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীল চাষের খরচও বৃদ্ধি পায় নীলকররা বিষয়টি বিবেচনায় রাখত না। তাছাড়া প্রথম দিকে তারা চাষিদের বিনামূল্যে নীল বীজ সরবরাহ করলেও পরের দিকে তাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নীল চাষ কৃষকদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তারা চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যায়। এসব বঞ্চনা আর দুর্ভাগ্যের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। আইন ছিল তাদের নাগালের বাইরে। আইন যারা প্রয়োগ করবেন। সেসব বিচারকদের বেশির ভাগ ছিল নীলকরদের নিজের দেশের লোক বা বন্ধু। আবার নীলকররাও অনেক সময় নিজেরাই অবৈতনিক (অনারারি) ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ পেতেন। ফলে আইনের আশ্রয় বা সুবিচার পাওয়া কৃষকদের জন্য ছিল অসম্ভব। এ অবস্থায় নীলকর সাহেবরা বাংলার গ্রামাঞ্চলে শুধু ব্যবসায়ী রূপে নয় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এক অভিনব অত্যাচারী জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরা এতটাই নিষ্ঠুর আর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে অবাধ্য নীল চাষিকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি।

নীল চাষিদের বিদ্রোহ

চরম অত্যাচার আর শোষণে বিপর্যস্ত দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নীল চাষিরা ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এই সব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় নীল চাষিরাই। যশোরের নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নবীন মাধব ও বেনী মাধব নামে দুই ভাই। হুগলীতে নেতৃত্ব দেন বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার।

নদীয়ায় ছিলেন মেঘনা সর্দার এবং নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই। স্থানীয় পর্যায়ের এই নেতৃত্বে বাংলায় কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। কৃষকরা নীল চাষ না করার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। এমনকি তারা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের উপদেশও অগ্রাহ্য করে। এদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি নীল চাষিদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী ছাপা হতে থাকে। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'নীলদর্পণ' নাটকের কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কৃষকদের জয়

প্রথম বারের মতো বাংলার সংগ্রামী বিদ্রোহী কৃষকদের জয় হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে নীল চাষকে কৃষকদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। অর্থাৎ কৃষক নীল চাষ করতে না চাইলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। তাছাড়া 'ইন্ডিগো কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট' বাতিল করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। পরবর্তিকালে নীলের বিকল্প কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে এদেশে নীলচাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	কোন কোন অঞ্চলে ব্যাপক নীল চাষ হতো? কী আবিষ্কারের ফলে নীল চাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়?

সারসংক্ষেপ

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ নীলকরদের সীমাহীন অত্যাচার শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে নীল চাষিরা যে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে তা-ই ইতিহাসে নীল বিদ্রোহ নামে খ্যাত। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর নেতৃত্ব দিয়েছিল স্থানীয় পর্যায়ের সাধারণ কৃষকরা। ফলে দেখা যায় যে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নেতা স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালিত করে। এই নেতৃত্ব এতটাই শক্তিশালী এবং সুসংহত ছিল যে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নীলচাষ করা, না করা কৃষকদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয় এবং 'ইন্ডিগো কন্ট্রাক্টস অ্যাক্ট' বাতিল করা হয়। ফলে নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নীল চাষিদের বিদ্রোহের প্রকাশ পায় কবে?
ক) ১৮৫৬ খ) ১৮৫৭ গ) ১৮৫৮ ঘ) ১৮৫৯

২। বাংলাদেশে একচেটিয়া নীলের ব্যবসা কাদের ছিল? (অনুধাবন)
ক) ফরাসি বণিকদের খ) ওলন্দাজ বলিকদের গ) ইংরেজ বণিকদের ঘ) বাঙালি বণিকদের

৩। নীল চাষকে কৃষকদের ইচ্ছাধীন করার ক্ষেত্রে কোন কমিশনটি সমর্থনযোগ্য? (প্রয়োগমূলক)
ক) সাদা কমিশন খ) সায়মন কমিশন গ) নীল কমিশন ঘ) চেমসফোর্ড কমিশন

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন। (অভিন্ন তথ্যভিত্তিক)
জমিদার দীপু মন্ডল জোর করে কৃষকদের দিয়ে তাঁর পছন্দের ফসল ফলাতে থাকে। এতে কৃষকরা নিজ স্বার্থ রক্ষায় এলাকার সাহসী সন্তান ননী ও রনীকে নিয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

৪। উদ্দীপকের ন্যায় ভারতীয় উপমহাদেশে এ ধরণের একটি বিদ্রোহের নাম কী?
ক) কৃষক বিদ্রোহ খ) নীল বিদ্রোহ গ) ফকির বিদ্রোহ ঘ) সাওতাল বিদ্রোহ

৫। ইংরেজ শাসনে এই ধরণের একটি বিদ্রোহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো–
i) ইংরেজ সরকারকে এদেশীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল করা।
ii) ভারতীয়দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীল চাষ করানো বন্ধ হয়।
iii) স্থানীয় পর্যায়ে কৃষক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির ঐক্য গঠন।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৪ ফরায়েজি আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ফরায়েজি আন্দোলন কী, তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফরায়েজি আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ফরায়েজি আন্দোলনে হাজী শরিয়ত উল্লাহ ও দুদু মিয়ার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফরজ, 'দারুল-হারব', নুন-ভাতের দাবি, মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দীন আহমদ, সশস্ত্র সংগ্রাম, ওস্তাদ, হলক।

ভূমিকা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা দখলের ফলে বাংলার মুসলমানদের অর্থনৈতিক ক্ষতি রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মতো শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতিতেও বিপর্যয় নেমে আসে। শিক্ষার অভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন নানা ধরনের অনাচার কুসংস্কারে ভরে যায়। এ অবস্থায় মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য উনিশ শতকে বাংলায় যে সংস্কার আন্দোলন হয় তার মধ্যে ফরায়েজি আন্দোলন অন্যতম। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন হাজী শরিয়ত উল্লাহ। তাঁর মৃত্যুর পর দুদু মিয়া এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

আন্দোলনের পটভূমি

ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরিয়াত উল্লাহ বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুর জেলায় ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর মক্কায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ইসলাম ধর্মের উপর লেখাপড়া করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি বুঝতে পারেন যে বাংলার মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাদের মধ্যে অনৈসলামিক রীতিনীতি, কুসংস্কার, অনাচার প্রবেশ করেছে। তিনি ইসলাম ধর্মকে এসব কুসংস্কার আর অনৈসলামিক অনাচার মুক্ত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। এই প্রতিজ্ঞার বশবর্তী হয়ে তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এক ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। হাজী শরিয়ত উল্লাহর এই সংস্কার আন্দোলনের নামই ফরায়েজি আন্দোলন।

ফরায়েজি মতবাদ

ফরায়েজি শব্দটি আরবি 'ফরজ' (অবশ্য কর্তব্য) শব্দ থেকে এসেছে। যাঁরা ফরজ পালন করে তারাই ফরায়েজি। আর বাংলায় যাঁরা হাজী শরিয়ত উল্লাহর অনুসারী ছিলেন, ইতিহাসে শুধু তাদেরকেই ফরায়েজি বলা হয়ে থাকে। শরিয়ত উল্লাহ যে ফরজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা ছিল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি অবশ্যপালনীয় (ফরজ) মৌলনীতি। এই মৌলনীতিগুলো হচ্ছে– ঈমান বা আল্লাহর একত্ব ও রিসালাতে বিশ্বাস, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত। ইসলাম অননুমোদিত সব বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে যা অবশ্য করণীয়, তা পালন করার জন্য তিনি মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানান।

হাজী শরিয়ত উল্লাহ

তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে পরেননি। শরিয়ত উল্লাহ ইংরেজ রাজত্বকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' অর্থাৎ বিধর্মীর রাজ্য বলে ঘোষণা করেন। তিনি বিধর্মী বিজাতীয় শাসিত দেশে জুমা এবং দুই ঈদের নামাজ বর্জনের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ফরায়েজি আন্দোলন

হাজী শরিয়ত উল্লাহর আহ্বানে বাংলার শোষিত, নির্যাতিত দরিদ্র রায়ত, কৃষক, তাঁতী, তেলি সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করে। শরিয়ত উল্লাহর উপর দরিদ্র জনগোষ্ঠির আস্থা, বিশ্বাস এবং তাঁর অসাধারণ সাফল্য নিম্নশ্রেণির

জনগণের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে। মুসলমানদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে জমিদাররা বাধা প্রদান করতে থাকে এবং নানা ধরনের কর আরোপ করে। তিনি প্রজাদের অবৈধ কর দেয়া থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন এবং জমিদারদের সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুতি নেন। দেশ জুড়ে অভাব দেখা দিলে তিনি নুন-ভাতের দাবিও উত্থাপন করেন। জমিদার শ্রেণি নানা অজুহাতে ফরায়েজি প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করলে শরিয়ত উল্লাহ প্রজাদের রক্ষার জন্য লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তার উপর পুলিশি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ফরায়েজি আন্দোলন ও দুদু মিয়া

হাজী শরিয়ত উল্লাহর মৃত্যুর পরে ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তাঁর যোগ্যপুত্র মুহম্মদ মুহসিন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া। তিনি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার মতো পন্ডিত না হলেও তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন একাধারে একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক শ্রেণির শোষণ মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। যার ফলে এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত শুধু ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। ইংরেজ শাসকদের চরম অর্থনৈতিক শোষণে বিপর্যস্ত বাংলার কৃষক এই আন্দোলনের মাধ্যমে শোষণবিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। হাজার হাজার কৃষক জমিদার, নীলকর সাহেবদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য ফরায়েজি আন্দোলনে যোগদান করে। দুদুমিয়া ছিলেন ফরায়েজিদের গুরু বা ওস্তাদ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শান্তিপ্রিয় নীতি বাদ দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। ফরায়েজিদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে দৃঢ় এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি নিজে লাঠি চালনা শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁর পিতার আমলের লাঠিয়াল জালালউদ্দিন মোল্লাকে সেনাপতি নিয়োগ করে এক সুদক্ষ লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের অবৈধ কর আরোপ এবং নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। এখানে উল্লেখ্য ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, যশোর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রবৃতি অঞ্চলগুলো নীল চাষের জন্য ছিল উৎকৃষ্ট। সুতরাং এই অঞ্চলগুলোতে নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রাও ছিল দুঃসহ ফলে কৃষকরাও হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহী। দুদু মিয়া তাঁর নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে স্বাধীন সরকার গঠন করেছিলেন। কৃষক প্রজাসাধারণকে নিয়ে স্বাধীন সরকারের একটি সেনাবাহিনীও (লাঠিয়াল বাহিনী) তিনি গঠন করেন। ফরায়েজিদের সরকার ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলাকে কতগুলো হলকা বা এলাকায় বিভক্ত করা হয়। দুদু মিয়া তাঁর অনুসারীদের নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী জমিদার, নীলকর এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম চালিয়ে যান। দেশীয় জমিদাররা বিদেশি ইংরেজ শাসক ও নীলকর সাহেবদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে থাকে। কিন্তু দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষী না পেয়ে তাকে বার বার মুক্তি দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলে ইংরেজ সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। ভীত ইংরেজ সরকার দুদু মিয়াকে রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে কলকাতার কারাগারে আটকে রাখেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুক্তি পান এবং ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে এই দেশ প্রেমিক দুঃসাহসী বিপ্লবীর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ফরায়েজি আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ ভারতে বাঙালি মুসলমানদের নৈতিক চেতনা আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে ফরায়েজি আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময়ে সবধরনের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে এই আন্দোলন। সুতরাং নিসন্দেহে পরাধীন ভারতে বাঙালি মুসলমানের জন্য এই আন্দোলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	ফরায়েজি শব্দটি কোন আরবি শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ কী? কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি ফরজ উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

ইংরেজ শাসন আমলে বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অধঃপতনও ঘটে। ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে নানা ধরনের কুসংস্কার অনাচার প্রবেশ করে। এসব থেকে বাঙালি মুসলমানকে উদ্ধার এবং ইসলামের বিধান মতো তাদের পরিচালনার জন্যই হাজী শরিয়ত উল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর মৃত্যু পর দুদু মিয়ার

নেতৃত্বে এই আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর সময়ে এটি কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয় এবং বিক্ষুব্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

১। কার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন গড়ে উঠে?
ক) হাজী শরিয়ত উল্লাহ খ) মুহসিন উদ্দিন দুদুমিয়া
গ) মীর নিসার আলী ঘ) ফকির মজনু শাহ

২। হাজী শরিয়তউল্লাহ প্রদত্ত উপদেশ সমূহের মধ্যে নিচের কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক) নিয়মিত নামাজ পড়া খ) ভালো কাজ করা
গ) জ্ঞানার্জন করা ঘ) অবৈধ কর থেকে বিরত থাকা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন। (প্রয়োগমূলক)

৩। জনাব মেহবুব উল্লাহ নিজ এলাকার কুপ্রথা ও ইসলাম বিবর্জিত কাজ দূর করার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন তার কার্যকলাপে কোন আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।
ক) ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের খ) খিলাফত আন্দোলনের
গ) ফরায়েজি আন্দোলনের ঘ) তিতুমীরের আন্দোলনের

৪। হিন্দু প্রভাবিত সমাজ ব্যবস্থায় মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত ছিল– (অনুধাবন)
i) পীরপুজা ii) কবরপুজা iii) মহররম মাসের তাজিয়া প্রথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

শাফকত সাহেব চাপিতলা গ্রামে তার সংস্কার কর্মকাণ্ডে জন্য আজও স্মরণীয়। এ গ্রামের শিক্ষার আলো বঞ্চিত মুসলিম গ্রামবাসীর মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার প্রভৃতি ছিল প্রবল। তারা পীর ফকিরদের মাজারে যাওয়া তাজিয়া নির্মাণসহ নানা কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল তাছাড়া জমিদারদের জুলুমে তারা অতীষ্ঠ হয়ে ওঠে। শাফকত সাহেব তাদের অনৈসলামিক কাজ থেকে মুক্ত করতে এবং জুলুম বন্ধে এগিয়ে আসেন। তাঁর এ পদক্ষেপ ঢাকা কুমিল্লাসহ অনেক জায়গায় জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ক. হাজী শরীয়ত উল্লাহ কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?
খ. নীল কমিশন কী? ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্কারকের সাথে পাঠ্য বইয়ে উনিশ শতকে বাংলার কোন সংস্কারকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উক্ত সংস্কারকের আন্দোলনই কৃষক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়, আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ ঃ ১. খ ২. গ ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ ঃ ১. ক ২. গ ৩. ক ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ ঃ ১. ঘ ২. গ ৩. গ ৪. খ ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ ঃ ১. ক ২. ঘ ৩. গ ৪. ঘ